বারীন সাহা

# টুকরো কথা

১

আমাদের শ'ুড়িদের মধ্যে তখন লেখাপড়ার চল ছিল না। আমার ঠাকুরদা ছিটকে চলে এসেছিলেন। ওকালতি পড়লেন নিজের চেষ্টায়। বললেন, মদের দোকান আমি করব না। আত্মীয়-স্বজনদের সব মদের দোকান। তারপর, আমার বাবা ডাক্তার হতে গেলেন, কাকা এনজিনিয়ারিং পড়তে গেলেন যাদবপুরে; আমার দাদা পড়াশুনো করেছেন ফিলসফি আর ল নিয়ে। আর আমি হচ্ছি র‍্যাকশিপ!

২

পনের থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত কম্যুনিস্ট পার্টি করেছি। লেখাপড়ায় খুব একটা ভাল ছাত্র ছিলাম না। কিন্তু শেষের দিকে আমি ভাল ছাত্র হয়ে গেলাম। বিয়াল্লিশ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে ফেল করলাম। পরের বার টেস্ট পরীক্ষায় বসিনি। স্কুলের কেরানি পেতলের গরাদের পেছনে একটা উঁচু টুলের ওপরে খাতা খুলে বসে পরীক্ষার ফি জমা নিচ্ছিলেন। বললেন, 'পরীক্ষায় বসিসনি? ঠিক আছে, টাকা জমা দিয়ে দিবি।' আমার এক বন্ধুর টাকাটা জমা নেবার পর, আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবার বললেন, 'কীরে তোর টাকাটা দে?' আমি বললাম, 'স্যার, আমার কত বাকি আছে?' খাতা খুলে দেখেন প্রায় দু-শ টাকার মতন বাকি—সারা বছরের মাইনে আর পরীক্ষার ফি। পরীক্ষার ফি যারা যারা দিয়েছে সবাই সেন্ট-আপ। ফি জমা দেবার পর, আমার এক ভাই, সেও পার্টি করত, তাকে বললাম, 'কী করি বল দিকিনি? দু-আড়াই মাস সময় আছে!' যা হোক করে একটা মাস্টার জোগাড় করা গেল। তিনি বললেন, 'মুখস্থ লিখলে আমি পড়াব না। ইংরাজি আর অঙ্ক করাব, বাকিটা তুমি নিজে পড়ে নেবে।' তখন বেশ কিছুদিন কম্যুনিস্ট পার্টি করি। প্রচুর বই পড়ি, ফলে আমার জেনারেল নলেজটা বেশি ছিল। আর একটা কনফিডেন্সও ছিল। দু-মাস পড়ে থার্ড ডিভিশনে পাশ করে গেলাম। মাস্টার বললেন, 'আশ্চর্য! কী করে পাশ করলে বলতো?' যেদিন রেজাল্ট বেরুল আমি হৃষিকেশ পার্কের কাছে বসেছিলাম। ভাবলাম, 'দেখতে

যাব ? আমি তো পাশ করতে পারব না !' এক বন্ধু এসে বলল, 'আমাদের আড্ডার অনেকে ফেল করেছে। তুই আর আমি পাশ করেছি।' আমি বললাম, 'এখন এটা প্রকাশ করবি না।' ভিড় ঠেলেঠুলে গিয়ে দেখি, হ্যাঁ, লেখা আছে। বললাম, 'আর একবার দেখি !' তিনবার দেখেছি। আমার বন্ধু পাশ করেছে বলে বাড়ি থেকে কিছু টাকা পেয়েছিল। ওর থেকে দশটা টাকা ধার করে বন্ধু-বান্ধব সকলে মিলে খেলাম। কিন্তু অনেকে ফেল করেছে বলে খাওয়াটা তেমন জমল না।

পার্টি থেকে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হতে বলা হল। কমার্সে ভর্তি হয়েছিলাম। বাড়িতে, পাড়াতে সকলে বললে, 'কমার্স ? সায়েন্সে যাও !' সায়েন্সে চলে গেলাম, ফেল করলাম। তারপর পড়াশুনো ছেড়ে দিলাম।

রণদিভের পিরিয়ডে যখন পার্টিতে অ্যাডভেঞ্চারিস্ট লাইন নিয়ে আসা হল, আমরা দশ-বারো জন বন্ধু তখন একসঙ্গে পার্টিতে কাজ করি। তার মধ্যে আমি, বাদল ( বাদল সরকার ) আর অজিত ( অজিতনারায়ণ বসু ) ছিলাম লিডিং পার্ট-এ। এক জায়গায় একটা কালভার্ট উড়িয়ে দিতে বলা হল আমাদের। আমি আর বাদল ( অজিত তখন জেলে ) ভাবলাম, এতো উচিত হবে না, সাধারণ লোক মারা যাবে আর তাছাড়া, স্ট্রাইক তো ফেল করেছে— এখন কালভার্ট উড়িয়ে কী লাভ ? যতটুকু পলিটিক্স বুঝি আর কি ! বলা হল, পার্টির ডিসিশন না মানলে বের করে দেওয়া হবে। আমরা বললাম, ইউনিটে আলোচনা করতে চাই, ইউনিটের ডিসিশন হলে করব, নইলে নয়। তখন সাসপেন্ড করে দেওয়া হল। সাসপেন্ডেড অবস্থায় বাড়ি থেকে আমায় অ্যারেস্ট করা হল। আই ওয়াজ দ্য ওনলি পার্সন হু নিউ অল দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড ডেনস্। কিন্তু, পুলিশ আমায় মারল না, খবর বের করার কোনো চেষ্টা করল না। জেলে গিয়ে দেখলাম, পার্টিতে আমার ঠিক ওপরে যে কাজ করে সেও অ্যারেস্টেড। সে সেন্ট্রাল কমিটির সব ডেন এর খোঁজ জানে। একদিন ফাঁকা পেয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ব্যাপার গো ?' বলল, 'ব্যাপার তো বুঝতেই পারছ। তোমাকে আর আমাকে ধরেছে, কোনো ডেন উড়ল না, কিছু হল না—' আমি বললাম, 'কী করবে ?' বলল, 'কী করব ? পার্টি ডিসিপ্লিন তো মানতেই হবে।' এরপরে জেলখানায় মারামারি হল, হাঙ্গার-স্ট্রাইক হল। এসব করার পর পার্টি-মেম্বারশিপ পেয়ে গেলাম। তারপর একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কী করবি এবার ? কাজ করবি ?' আমি বললাম, 'না, এবার ছেড়ে দেব।' সাসপেন্ডেড অবস্থাতে তো ছাড়া যায় না, মেম্বারশিপ পেয়ে ছেড়ে দিলুম।

৩

ইউরোপে যখন যাই, ফিল্ম শেখার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমার আর্ট-এর কোনো ট্রেনিং ছিল না। ফিল্ম শেখার ইচ্ছেটা অন্য অনেকগুলো ইচ্ছের মধ্যে

মিশে ছিল। বিদেশের বিভিন্ন কোর্সে অ্যাপ্লাই করি। তার মধ্যে, ফিল্ম ছাড়া ফার্মিং, অটোমোবাইল এনজিনিয়ারিং আর ফোটোগ্রাফি ইত্যাদি ছিল। শেষ পর্যন্ত ফিল্ম-এ সুযোগ পেলাম। তখন ফরাসি শিখতে হল। পরে ইতালিয়ান শিখতে হল।

ফিল্ম-এর ক্ষেত্রে আমার পজিশনটা হল— আমি আদ্রে বাজ্যাঁর থিওরিতে বিশ্বাস করি। 'ইমপিওর সিনেমা'-র থিওরি। ফরাসি দেশে থাকার সময় হি ওয়াজ এ রোরিং ফিল্ম ক্রিটিক, ওর লেখা বইগুলো সম্ভবত কিছুদিন পরে বেরিয়েছে। 'কাইয়ে দ্য সিনেমা' গ্রুপের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ছিল। নিউ- ওয়েভ-এর ত্রুফো, গোদার, শ্যাব্রল-এর সঙ্গে বাজ্যাঁর দহরম-মহরম ছিল। পরে অবশ্য ডিফারেন্স হয়ে যায়। ক্রিটিসিজম্ যতই করুক, হি ওয়াজ হাইলি রেসপেকটেড। এমনকি লেফট্-রাও ওকে রেসপেক্ট করত। যুদ্ধের পরে ফ্রান্সে তখন এভ্রি থার্ড ম্যান ওয়াজ এ কম্যুনিস্ট ভোটার। লেফট্-রা ফিল্মের একটা প্যারালাল মুভমেন্ট ডেভেলপ করাতে আরম্ভ করে। সিনে ক্লাব দাকসিঁয়ো বলে একটা গ্রুপ করল। তারা সোস্যাল কনটেন্টে বিশ্বাস করত— ইফ দেয়ার ইজ এনিথিং কলড্ কনটেন্ট। 'কাইয়ে'-দের গুরু ছিল হিচকক। হিচকক তো প্রায় অ্যাবস্ট্রাক্ট সিনেমার মতন সাসপেন্স তৈরি করে— এরা এ ধরনের সিনেমা পছন্দ করত। অবশ্য নিজেরা যা করেছে, তার সঙ্গে হিচককের অনেক তফাত। কিন্তু থিওরিটিক্যাল আলোচনায় হিচককের নামে কিছু বললে মারামারি লেগে যেত। ইমপিওর সিনেমা, অর্থাৎ এর মধ্যে সবকিছু ঢোকে। রেনেই বল আর রঁগ্রিয়েই বল ( রঁগ্রিয়ে বেসিক্যালি লেখক পরে ফিল্ম করেছে ) মনে হয় ওই রকম প্লেনেই যাওয়া উচিত। ভাবনাটা আমারও ওইরকম। আমি যখন ছবি করেছি, মোটামুটিভাবে আদ্রে বাজ্যাঁ ফিল্ম সম্পর্কে যা বলে আমার ট্রেনিংটা ওইখানে ছিল। কিন্তু এই ভাবনাটা ডেভেলপ করেছে ছবি করার পর।

একটা ফোটোগ্রাফিক ইমেজের আলোচনায় যেমন ইউ ক্যান নট ডিসকাস ইট উইদাউট ইয়োর ফর্মার কালচার অফ পেন্টিং, ফিল্ম-এর গল্প যদি অ্যাডাপটেশন হয় তাহলে লিটারেচারের আলোচনায় যেতে হয়, তেমনি ইমপিওর ফিল্মের আলোচনাতে অন্য শাখার শিল্পের প্রসঙ্গ মিশে থাকে।

আমার দুটো বাবা, একজনতো ঐ আদ্রে বাজ্যাঁ। কারণ আমি নিউ-ওয়েভ ছবি পছন্দ করি। নিও-রিয়্যালিস্ট অনেক ছবিও আমার পছন্দ। খুব কমন— বাইসাইকেল থিফ— দারুণ ভাল লাগে আমার। ইকনমিক পয়েন্ট ফোরফ্রন্টে চলে আসে বলে অনেকে যতই ব্লেম করুক আমরা ছবির সেই লোকটা গরিব বলে ওটাকে নিও-রিয়্যালিস্ট হিসাবে ক্লাসিফাই করেছি। কিন্তু ওর মধ্যে অনেক হিচকক আছে। বাচ্চাকে খোঁজার সময়ে হিচককের 'স্পেল বাউন্ড'-এর মতো সাসপেন্স ডেভেলপ করে।

আরেকজন রেনোয়া। রেনোয়া ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর ইন ফ্রেঞ্চ ফিল্ম। নিও-ওয়েভ, কাইয়ে গ্রুপদের রেনোয়া-তে আপত্তি নেই। ওর সম্পর্কে আমি কিছু কিছু

আগেই জানতাম। সব ছবি দেখেছি। মানে তখনকার দিনে যা দেখা সম্ভব। ওর যে ধরনের কাজের পদ্ধতি সেটা আমি অ্যাডমায়ার করি। হয়ত ফ্লোরে গিয়ে অ্যাক্টরদের বলল, 'হ্যাঁরে, তোর কী বলার ইচ্ছে যাচ্ছে আজকে?' নিজের কাজের ক্ষেত্রে একেবারে ওইভাবে করতে পারিনি আমি। তবে অনেক সময়, পাঁচজনে হয়ত বলল, 'বারনিদা, এটা হলে ভাল হয়', তখন সেটা আমি করেছি। রেনোয়ার আর যে ব্যাপারটা আমার পছন্দ তা হচ্ছে ওর ইম্প্রোভাইজেশন। থিম নিয়ে মিউজিসিয়ানদের মতো কাজ করত। অনেক সময়েই স্ক্রিপ্ট যেত পালটে।

বর্তমানে আমার ইনফ্যাচুয়েশনটা রেনে আর রগ্রিয়ের ওপর। অবশ্য আমার ছবির সঙ্গে ওদের কোনো মিল নেই।

যদি কেউ প্যাট্রিয়ার্কাল লিনিয়েজ খোঁজে তাহলে বলব, শিল্পী হিসাবে আমি অরফ্যান। একটু ক্ল্যারিফাই করলে বলতে হয়, 'আই অ্যাম লুকিং ফর এ ফাদার!' সেই যে আছে না বাস্টারকিটানের একটা ছবিতে। বাপ কৃষক, ছেলে শহরে এসে লায়েক হয়েছে। বাপ ছেলেকে চিনতে পারছে না। এমন তার চেহারা হয়েছে। তো প্ল্যাটফর্মে ছেলেকে পায়চারি করতে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'আর য়ু লুকিং ফর এ ফাদার?'

আমাকে যদি কেউ নিও-রিয়্যালিস্ট বলে থাকে— দ্যাট ইজ রং। আমি যখন ইওরোপ থেকে ফিরেছি ওখানে তখন নিও-রিয়্যালিজম্ শেষ হয়ে গেছে। না, আমি এখানে তা নিয়ে আসিনি। আই নেভার থিংক দ্যাট আই অ্যাম এ নিও-রিয়্যালিস্ট। লোকে বললে আমার কিছু করার নেই। আর একটা জিনিস হচ্ছে নিউ-ওয়েভও প্রায় শেষ। অর্থাৎ গোদার শ্যাব্রল, ত্রুফো-এঁরা। আমার প্রবলেম হল ছবি করার সময় আমার কাছে ওরকম থিওরি টিওরি কিছু ছিল না।

নিও-রিয়্যালিস্টরা— দে ইউজড্ টু প্রেফার আউটডোর। সম্ভবত, আমিও আউটডোরে ছবি করেছি বলে আমাকে নিও-রিয়্যালিস্ট বলা হয়েছে। কিন্তু আমার আউটডোরে যাওয়াটা নিও-রিয়্যালিস্টদের মতো নয়। বিশ / তিরিশ বছর ফ্যাসিজম্-এ থাকার পর তখন নিও-রিয়্যালিস্টরা হয়ত নিশ্বাস ফেলতে পারল। যুদ্ধের পর তারা বলল, ক্যামেরা আর ভেতরে থাকবে না, ক্যামেরা বাইরে বেরিয়ে যাবে। তখন ইনক্লুডিং ভিসকন্তি সবাই নানারকমের ছবি করেছে।

আমার লোকেশনে যাওয়াটা কিন্তু তেমন ছিল না। এক জায়গায় একটা সার্কাস বসে। ঊনিশ পয়সার সার্কাস। এই চিত্রটা আমায় তুলতে হবে। এ জিনিস আমি পয়সা খরচ করে সেট-এ করতে পারব না। এটা আমাদের সাধ্যে কুলোবে না অত সঙ্গতি নেই, তাই সত্যিকারের সার্কাস খুঁজতে হল। যে সার্কাস বাস্তবে আছে, সেটাই আমি সেট হিসাবে ব্যবহার করব। 'লক-স্টক অ্যান্ড ব্যারেল' — বলে না, এটা ছবিতে তোলা যায় এবং ওটাই আমাকে করতে হল। কয়েকটা নাইট-শুটিং ছিল। আমি ঠিক করলাম, আমার নলেজ কে একটা এক্সপেরিমেন্ট এর মধ্যে নিয়ে যাব— ক্যামেরা থেকে শুরু করে সমস্ত

কিছুকে এক্সট্রিমে নিয়ে যাব।

লোকেশনটা ছিল একটা গঞ্জ— তেরোপেখিয়া— জায়গাটা মহিষাদল থেকে সাত / আট কি.মি. দূরে, হলদি নদীর পাশে। মহিষাদলের রাজা তেরোজন পাইক পাঠিয়ে ওই গ্রামটা দখল করেছিল— তাই ওই নাম। স্থানীয় এক কবির মুখে শুনেছি আগেকার দিনের লোকাল পারিকেশনেতে পাওয়া গেছে— হল্‌দি নদীকেই তেরো নদী বলা হত। আমার মনে হয়েছিল 'তেরো নদীর পারে' মানে— ইট ইজ এ ফার ফেচেড স্টোরি। তেরো-পেখিয়ায় কোনো বসত বাড়ি নেই। শুধু একটা বাজার। সপ্তাহে দু-দিন হাট বসে। হাটবার বলে। যেদিন দোকানগুলো খোলা হয় না সেদিন গড়হাট। আর, বছরে একটা দুটো সময়ে ফেস্টিভ্যাল এর আকার নেয়। মেলা বসে, রোজই হাট হয়। পাইকাররা কেনাবেচা করে নৌকোয় উঠে কাকদ্বীপ চলে যায়। দেয়ার ওয়াজ নো ডাইরেক্ট লিংক উইথ ক্যালকাটা। জায়গাটার একটা হিস্টারল্যান্ড আছে — নন্দীগ্রাম। আর কোনো বড় বাজার নেই। আমার মনে হয়েছিল যদি বাইরে থেকে টেকনিশিয়ান, জেনারেটর আর অন্যান্য জিনিসপত্র আনি, ওই অঞ্চলকে আমি ম্যানিপুলেট করতে পারব টু ইউজ্ ইট অ্যাজ মাই সেট। ছবি আঁকতে গেলে যেমন রঙ-তুলি ক্যানভাস দরকার, ফিল্ম মেকারের সমস্যা হল, ছবি করার সময় টুলস্ অ্যাভেইলেবল্ হতে হবে।

এভাবে ছবি করার সূত্রপাত। এর মধ্যে কোনো তত্ত্বের ব্যাপার তখন ছিল না। তত্ত্বের ব্যাপার যেটা বলছি সেটা আমার আজকের ব্যাপার বা অনেক পরের ব্যাপার। বার্ষাট্ট সাল থেকে আরম্ভ হল আমার তত্ত্বের আগ্রহ। তার আগে তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। অবশ্য তত্ত্ব জানতাম, কারণ ফিল্ম-স্কুলে পড়াশোনা করলে তত্ত্ব জানতেই হয়।

'আউটডোর' নিয়ে অনেকেই নানারকম ক্লেম করে থাকে। এক্ষেত্রে আমার মনে হয় নিমাইবাবুর 'ছিন্নমূল' অনেকটা সফল। ছবিতে 'ক্লাফটস্‌ম্যানশিপ' যদিও উঁচু পর্যায়ে পৌঁছয়নি তবে ক্যামেরাকে আউটডোরে নিয়ে এসে সমসাময়িক বাস্তবকে ধরবার একটা চেষ্টা করা হয়েছে।

## ৪

ব্যক্তিগতভাবে আমি অ্যাডাপটেশনের বিরুদ্ধে। ইট ইজ অলমোস্ট এ রি-হিটেড মিল। অনেকেই অ্যাডাপটেশন করেছে। কিন্তু 'পথের পাঁচালি' হ্যাজ এ স্পেশাল প্লেস। ওতে সত্যজিৎবাবুর অনেক নিজের জিনিস আছে।

'পথের পাঁচালি' বাংলা ছবি বা ভারতীয় ছবির একটা ল্যান্ডমার্ক। অত সুষ্ঠুভাবে কেউ ছবি করেনি। কিন্তু এ ছবির কতগুলো ড্র-ব্যাকস্ আছে। প্রচুর কাঁপ করা জিনিস

আছে।* ছবি দেখে, রোসেলিনির ফার্স্ট রিএ্যাকশন হচ্ছে— 'আচ্ছা এর মধ্যে রায় তো নেই! এতে দনস্কোই আছে, আইজেনস্টাইন আছে, রে ইজ নট দেয়ার।' আর ছবির— ইডিয়মস্ আর নট হিজ ওন থিং। ইট ইজ অলরেডি অ্যান ওল্ড স্কিম। সে জন্য একে মাস্টার-পিস বলা যায় না।

এছাড়া আরও কিছু জিনিসের ওপরে ছবিটা নির্ভরশীল হয়ে আছে যেগুলো হ্যাবিটের ব্যাপার। যেমন হরিহর যখন এল তার আগেই দুর্গা মারা গেছে। হরিহর যখন এল, সর্বজয়া কাঁদল, হঠাৎ ব্রেক-ডাউন করল, তখন ওই তার-সানাইটা কার জন্য? দর্শকের জন্যই হবে! কারণ দুর্গা তো আগেই মারা গেছে। হরিহর জানতনা, আর সর্বজয়া কাঁদল। হরিহর বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে রইল। দর্শকের জন্য যদি হয় তো হি হ্যাজ আন্ডার-এস্টিমেটেড দ্য অডিয়েন্স। ওখানকার চিত্রগুলো দেখে মনে হয় না ওটা হরিহরের জন্য। সেরকম আইডেনটিফিকেশন-এর স্কোপ নেই। আমি অবশ্য 'পথের পাঁচালি' দেখেছি ইওরোপ থেকে ফিরে। ভুলও হতে পারে। কিন্তু এই তার-সানাইয়ে সবার সঙ্গে আমিও ইনফ্লুয়েন্সড। আমার কাছে মনে হয়েছে এটা খুব সস্তার জিনিস। সব জায়গায় যেখানে আন্ডারস্টেটমেন্ট সেখানে হোয়াই মিউজিক শুড বি সো লাউড? আন্ডারস্টেটমেন্টটাই ভাল লাগছে কারণ নিজেদের ইমোশনটা ওই গ্যাপ-এ দিতে পারছি।

হিউম্যান কনটেক্সট এ ধরলে আমি বলব 'পথের পাঁচালি' ইজ এ ভেরি গুড ফিল্ম। কিন্তু ইনডিয়ান কনটেক্সটে ধরলে অনেক তফাত হয়ে যায়। ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ পেলে মনে হয় এ প্রাইজ ফিল্ম-এর জন্য নয়—ভারতবর্ষের জন্য। আর ভারতবর্ষ তো ওই দেখানো হয়েছে!

কিন্তু আমি এও ভেবে দেখেছি যে পথের পাঁচালি না থাকলে বাংলা ছবির কী অবস্থা হত! ইট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফিল্ম অ্যাজ ফার অ্যাজ বেঙ্গলি ফিল্ম ইজ কনসার্নড। এত সিনেম্যাটিক ছবি আর হয়নি।

৫

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালই ছিল। ল্যাবরেটরিতে যখন 'রাশ' দেখতাম, একদিন আমাকে বললেন, 'অনেককে ছবি দেখাচ্ছেন, আমাকে দেখাচ্ছেন না।' আমি কাউকেই ডেকে দেখাইনি। আমার 'রাশ' দেখার সময় ঋত্বিক যদি ঢুকে পড়েন তো আমি

---

* ১। 'ইভান দি টেরিবল'-এর সেই বুড়ির খাওয়ার দৃশ্যটা মনে পড়ে যায়।

২। 'ডি সিকা'র ছবিতে লাল জামাকাপড় পরা দুজন জার্মান পাদ্রীকে ছেলেটা দেখছে—এর সঙ্গে 'অপরাজিত'-তে টীনেরা ছবিঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে—এ দুটো দৃশ্যের মিল আছে।

কী করব ? বের করে দিতে পারি ? ঋত্বিক যেমন ঢুকেছিলেন তেমন অনেক টেকনিশিয়ানরাও আসতেন। কথাটা সত্যজিতের কানে গিয়েছিল। আর 'রাশ' দেখে 'টেকনিক' ছাড়া আর কোনো বিষয়ে কথা বলা যায় না। আমি সত্যজিৎকে বললাম, 'আপনি বললেই দেখাবো।' সত্যজিতের রাগটা হচ্ছে যে আমি ওঁর কাছে যাইনি। যাঁরা যান, তাঁদের ওপর উনি বিরক্ত হন, কিন্তু যাঁরা কোনোদিনও যাননি তাঁদের সম্পর্কে ওঁর মনে মনে শ্রদ্ধা থাকলেও বাইরে কিন্তু যা তা বলেন। আমাকে একবার একজন বন্ধু বলল, 'বিলেত ঘুরে এলে, সত্যজিতের সঙ্গে দেখা করলে না ?' সত্যজিৎ তখন সাউথ ক্যালকাটার পুরনো বাড়িতে থাকতেন। গেলাম একদিন। বললেন, 'লেটেস্ট কী ছবি দেখেছেন ?' আমি বললাম, 'একটা কমার্শিয়াল ছবি দেখলাম, 'অ্যাক্সস প্যারিস'— খুব ভাল লেগেছে। গল্পটা বললাম। জার্মান অকুপেশনের মধ্যে একজন সাধারণ কৃষক আর একজন দালাল টাইপের লোক—একটা বড় ছাগলকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে রান্না করে খাবে। কী ভাবে তারা ছাগলটাকে সাধারণ লোক, গেস্টাপো, আর্মি এদের হাত এড়িয়ে নিয়ে যাবে—এই নিয়ে হিলারিয়াস একটা ছবি। একজন অভিনেতা ( বুভ্‌রিল ) ছিল তার চেহারা একেবারে খাঁটি ফরাসি কৃষকের মতো। আমি বললাম, 'এটা আমার খুব ভাল লেগেছে।' বললেন, 'আর, নিউ ওয়েভ ?' আমি বললাম, 'ওতো আগেকার কথা !'

আমার ছবিটা রিলিজ হওয়ার পর একদিন বললেন, 'একটা কার্ড দিন।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাকে দেবেন ?' বললেন, 'ডোভিড ম্যাকারাচেন বলে আমার এক বন্ধুকে দেব।' আমি অ্যাড্রেস জেনে নিয়ে নিজেই কার্ডটা পৌঁছে দিয়ে এলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'অনেকে তো নানারকমভাবে ছবি করেছে. আপনিও তো অমনভাবে করতে পারেন।' আমি বললাম, 'যারা করছে করুক। আর একজন লোক বাড়িয়ে কী লাভ ?'

'তেরো নদীর পারে'-র সমালোচনা করতে গিয়ে প্রায় সবাই খারাপ বলেছিল। ব্যতিক্রম জ্যোতির্ময় দত্ত। চৌষট্টি সালে 'স্টেটস্‌ম্যান'-এ ও লিখেছিল— 'দি ফিল্ম ইজ ওয়েটিং টু ক্ল্যাক দি স্ক্রিন।' একবার ওকে খুব রাগিয়ে দিয়েছিলাম। এক জায়গায় বসে কয়েকজনের সঙ্গে মদ খাচ্ছিল। তখনকার দিনের কয়েকজন ইন্টেলেকচুয়াল ওই আড্ডায় ছিল। ওদের মধ্যে বিনয় মজুমদার ছিল, একজন অ্যামেরিকান ভদ্রলোকও ছিল। সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিল ওরা। এক বন্ধু আমাকে নিয়ে গেছে— আমি চুপ করে বসেছিলাম। জ্যোতির্ময় দত্ত জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কী করেন ?' বললাম, 'আমি তো ছবি করি, তবে ইদানিং কিছু করতে পারছি না।' 'ছবি করেন ? কী ছবি করেছেন ? আমি তো শুনিনি।' আমি বললাম—'তা শুনবেন কেন ? জার্নালিস্ট, ফিল্ম নিয়ে লেখেন, আমার ছবির কথা আপনি শুনবেন কেন ? কোন কারণ নেই—'। আমার পেটে তক্ষণে হিউজ পড়েছে। শুনে বলল, 'সেকী কথা ? আমায়

ছবিটা দেখান। আর আমি কাউকে সঙ্গে আনতে পারি ?' আমি বললাম— 'যাকে ইচ্ছা আনতে পারেন।' তারপর জ্যোতির্ময় দত্তের লেখা বের হল। পড়ে মনে হল— লোকটা স্পিরিটেড, যা ফিল করে, তা লিখতে পারে।

৬

দেবুদার ( দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ) সঙ্গে খালাসিটোলায় যেতাম। কমল মজুমদারের সঙ্গে ওখানেই আলাপ। যদি কমল মজুমদারের সামনে অন্য কারো সঙ্গে আপনার আলাপ হয়, তবে আলাপটা ডিসটর্টেড হয়ে যেতে বাধ্য। কমলবাবুকে সবাই এমন একটা পেডেস্টালে বসিয়ে দিয়েছিল যে ওর সামনে কেউ মুখই খুলত না। মদ খেয়ে কমলবাবু যা বলতেন তার বেশিরভাগই বাজে কথা। কিন্তু যখন লিখতেন, তখন তিনি আর্টিস্ট।

একটা গল্প বলি। খালাসিটোলা থেকে বেরিয়ে আমরা শিয়ালদা অবধি হাঁটতাম। কমলবাবু আর দেবুদা বেলেঘাটার দিকে যেত, আর আমি একটা বাস ধরে চলে আসতাম। কমলবাবু একদিন হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'বারীনবাবু, আজ আপনাকে একটা সিনারিও বলব।' সেদিন শেষ হল না। বললেন, 'আরেকদিন হবে।' পরের দিন আবার দেখা। বললাম, 'কমলবাবু, ওই সিনারিওটা কমপ্লিট হোক।' উনি বললেন, 'কী বলেছিলাম বলুন তো ?' আমি বললাম, 'সে তো সম্পূর্ণ মনে নেই—'। কমলবাবু বললেন, 'থাক, আর একদিন নতুন একটা সিনারিও শোনাব আপনাকে।' সব বানিয়ে বানিয়ে বলতেন। লোকটার বানাবার ক্ষমতাও ছিল প্রচুর। আমি অ্যালবার্ট হলে কোনোদিনই ওঁর টেবিলে বসতাম না। একদিন কমলবাবু একজনকে দিয়ে বলে পাঠালেন, 'বারীনবাবুকে একবার আমার টেবিলে আসতে বল।' টেবিলের কাছে যেতেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে অন্য একটা খালি টেবিলে উঠে এলেন। বললেন, 'আপনি সেদিন 'টার্কিশ কফি' খাওয়ার গল্প বলছিলেন না— তা আমি যখন আরবদেশে গিয়েছিলুম, একবার সেই উটের পিঠে চড়ে—', ওখানে ততক্ষণে আর একজন এসে জোর করে বসে পড়েছে। বলল, 'কমলদা, আপনি কবে গিয়েছিলেন ?' আমি ভদ্রলোককে বললাম, 'আপনি থামুন তো মশাই !' কমলবাবু ওঁকে দেখিয়ে বললেন, 'কী বলব বলুন দিকিনি বারীনবাবু ? এটা একটা কোনো গপ্পো ?' কমলবাবু সিম্পলি বানিয়ে বলে যাচ্ছিলেন। উনি জানতেন, কফিটা ওরাই আবিষ্কার করেছে, ওরাই খেত আড্ডা মারার জন্যে, আর উটের পিঠে চড়ে অনেক দূরে চলে যেত শুধু গল্প করার জন্য। এর মধ্যে বৈষয়িক কোনো ব্যাপার থাকত না। আর কফিও খেত একটুখানি। আসলে ওটা ছিল আরব কফি, পরে 'টার্কিশ কফি' বলে পরিচিত হয়। কমলবাবুর ধরনটাই ছিল এরকম কিন্তু এরা সবাই সিরিয়াসলি নিত। সেদিন যে কটা ফরাসি কথা বলেছিলেন সবই খুব কুতিয়ে

কুণ্ঠিয়ে বলেছিলেন। বললেন, 'জানেন, আমি তো আরবি জানতুম না, ওরা অনেকে ফরাসি জানে— আমি তাই বললুম', আমি ফরাসি শুনে বুঝতে পারলাম যে ডায়লগ-গুলো উনি মুখস্থ করে এসেছেন শুধু ওই গল্পটা বলার জন্য। এক্স-টেম্পো বলতে পারবেন না। অবশ্য উনি ফরাসি বই পড়তে পারতেন। আর উচ্চারণটা বিষ্ণুবাবুর মতো খারাপ ছিল না।

৭

ছবি টি.ভি.-তে দেখানো— তার জন্য তদ্বির করা আমার পছন্দ নয়। তিরিশ বছর ধরে একটা ছবি নিয়ে পড়ে থেকে কেউ যদি সেটাকে নার্স করতে আরম্ভ করে, এ যেন, একজন নিকট আত্মীয় — যে অথর্ব হয়ে গেছে, তুমি তার সেবা করে গেলে, তার জন্য খরচ করে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলে— এ রকম একটা ব্যাপার। যা করেছি, করেছি— এখন তো দু-বেলা খেতে পাচ্ছি—

অন্যেরা চেষ্টা করলে অবশ্য আমার আপত্তি নেই। দিল্লিতে একটা প্রিন্ট দিয়েছিলাম। ওরা একজনের মারফৎ মুখে জানিয়েছে যে ছবিটা নতুন সার্টিফিকেটে চলবে না, তাই এখন ক্লাসিক হিসেবে দেখানো হবে।

আমাকে নিয়ে একজন (গৌতম চ্যাটার্জী) একটা ডকুমেন্টারিও করেছিল। ওতে অভিনয়ের জন্য দু-হাজার টাকা আমাকে দিয়েছিল। আমি এখন মনে করি আমার চার-বছর বিদেশে পড়ার কোনো মানে হয় না। টালিগঞ্জে ঢুকে তখন একজন গুরুর কাছে গিয়ে ছবিটা কীভাবে কাটিং হয়, কীভাবে তুলতে হয়, ইউনিটটা কীভাবে চালাতে হয় এসব শিখে নিলেই চলত।

আমাদের দেশে ডিরেকটারকেই প্রোডাকশন-এর কাজ চালাতে হয়। পয়সাকড়ি কাকে কী দেওয়া হবে এসব হিসাবও করতে হয়। অর্থাৎ কাজ করার সময়ে পিওরলি আর্টিস্টিক ফিল্ড আমরা পাই না। ইউনিটের কথা ভাবতে হয়, টেকনিকের কথা ভাবতে হয়। যেমন, বিভিন্ন সিকোয়েন্সে লাইট কতটা দরকার হতে পারে। বেশির ভাগ সময়ে সায়লেন্ট ক্যামেরা ব্যবহার করেছি। চিন্তা করে রাখতে হয়েছে কখন একটা সাউন্ড ফ্যাকটর দরকার হবে— আর তখন সাউন্ড ভাড়া করে নিয়ে আসতে হবে। এ ছাড়া সিনক্রোনাইজে-শনের সমস্যা আছে। এরকম নানা প্রবলেম আমাদের দেশে ডিরেকটারকেই সল্‌ভ করতে হয়, ডিরেকটারই প্রোডিউসার হয়ে যায়। কাকে কত দেবে, খাওয়াতে কত খরচ— প্রায় ম্যানেজারের কাজ। আর ম্যানেজার যে থাকে সে বাজার-সরকারের কাজ করে। □